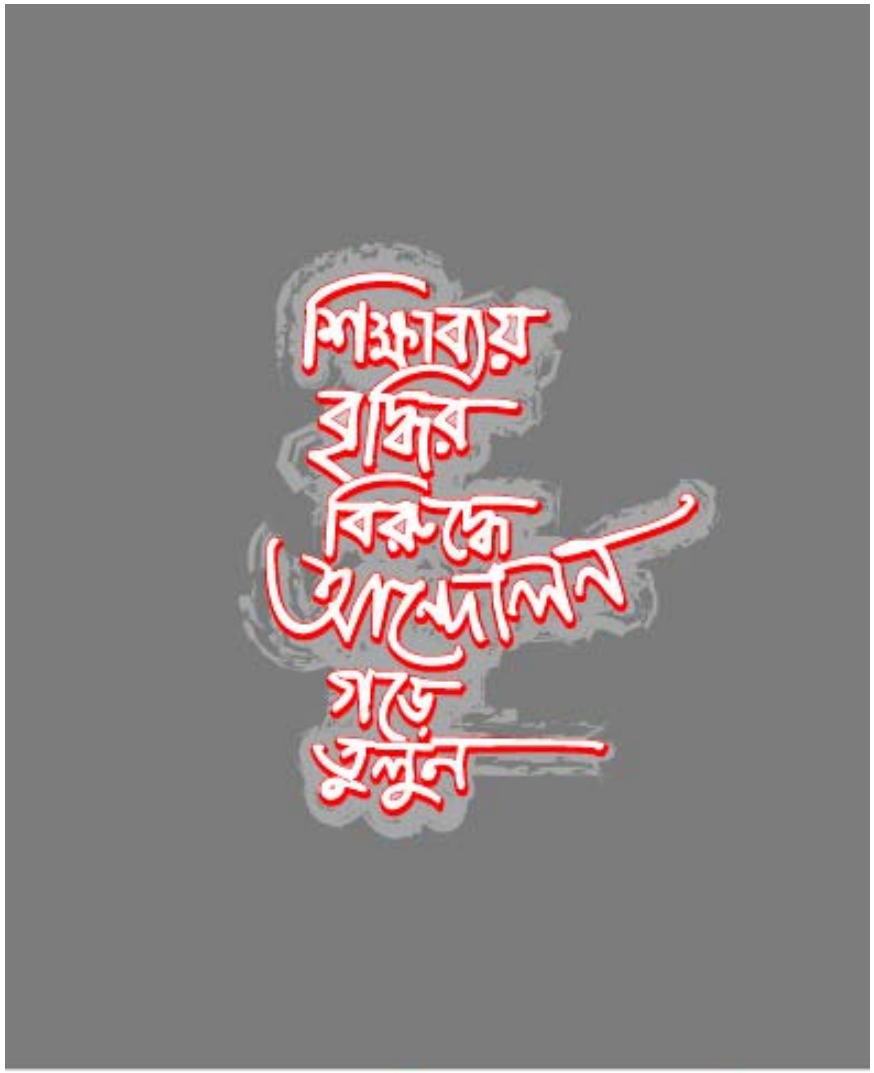

ভূমিকা

‘শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার’ শাসকদের কল্যাণে এ কথা আজ ভুলতে বসেছে দেশের জনগণ। বরং টাকা ছাড়া শিক্ষা পাওয়া যাবে না এই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার নতুন করে যত নীতিমালা, আইন প্রণয়ন করছে তাতে শিক্ষা ব্যবসার এই প্রক্রিয়া আরও তীব্রতর হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ইউজিসি’র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭.৫ শতাংশ কর আরোপের সিদ্ধান্ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অসংখ্য নিয়ম কানুন আরোপ, প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি প্রণয়ন ইত্যাদি এই সত্যকেই প্রতিভাত করছে। অথচ স্বাধীন দেশে অসংখ্য ছাত্র আন্দোলন-গণ আন্দোলন থেকে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে এদেশের ছাত্রসমাজ তথা সাধারণ মানুষের তরফ থেকে। তাই শিক্ষা নিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা আর শাসকের পরিকল্পনা আজ পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের সকল মানুষের শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা আন্দোলন তীব্র করার বিকল্প নেই। একইসাথে আন্দোলনকে সঠিক ধারায় পরিচালনা করতে আদর্শগত বিতর্কও জরুরি। সেই প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে দেশের শিক্ষার সংকট এবং করণীয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই পুস্তিকায় তুলে ধরছি। আমরা মনে করি একটি যথার্থ শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে এই বক্তব্য সহায়ক হবে। পুস্তিকার যত অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা আপনাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পাবে। আপনাদের মতামত প্রত্যাশা করি।

শুভেচ্ছাসহ

স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি

সাইফুজ্জামান সাকন
সভাপতি
কেন্দ্রীয় কমিটি

শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন

কোথাও আশার আলো দেখা যাচ্ছে কি? সরকারি ভাষ্য বলছে, আমরা এগুচ্ছি প্রতিনিয়ত। এখন নাকি আমরা মধ্যম আয়ের দেশ! প্রবৃদ্ধি, জিডিপি, মাথাপিছু আয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ– কত পরিসংখ্যান! কিন্তু মধ্যম আয়ের দেশে মধ্যম মানের জীবন যাপন করতে পারছে কি মানুষ? গেল ঈদে বাদর ঝোলা হয়ে বাসে-ট্রেনে যাতায়াতের ছবি যেন একথাই বলছে – এভাবে জীবনে ঝুলে আছে মানুষ! পত্রিকায় ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকের আহাজারির খবর আসে। কয়েক মাসের বকেয়া মজুরির দাবিতে রাস্তায় নামে শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় যে গার্মেন্টস খাতে, তার শ্রমিকদের জীবনে এর ফল কি? বছর ঘুরে বাজেট হয়। সাধারণ মানুষ চোখে অন্ধকার দেখে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ জনসংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ ক্রমশ নিম্নমুখী। বেড়েছে নানা করের বোঝা। অন্যদিকে মানুষকে নিঃস্ব করে গড়ে ওঠা কালো টাকা বরাবরের মতোই সাদা করার বিধান রাখা হয়েছে। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা যেকোন সময়ে কার্যকর হবে। কাজ খুঁজে না পেয়ে জীবনের সহায়-সম্বল বিক্রি করে সভ্য জমানায় দাস ব্যবসার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সরকার দলীয় এমপিসহ জড়িত চক্রের নাম বারবার পত্রিকায় এলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। কারণ এরা যে সরকারি লোক! খুন-বিভৎসতা মাত্রা ছাড়াচ্ছে ক্রমশ। চোর সাজিয়ে সিলেটের শিশু রাজনের হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশকে ঘুষ দিয়ে খুনির দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়া সমাজের ভেতরের রুগ্ন চেহারাটিকে পুনর্বার উন্মোচিত করেছে। এর রেশ কাটতে না কাটতেই মাগুরায় সরকারি দলের লোকজনের (আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে) গোলাগুলিতে গুলিবিদ্ধ গর্ভধারিণীর গর্ভের শিশুটির মৃত্যুযন্ত্রণা একথাই জানান দিচ্ছে – ঘরে-বাইরে কেউই নিরাপদ নই আমরা। এভাবে একের পর এক হত্যাকাণ্ড অথচ খুনিরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে। তারপরও গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের জয়জয়কার!

কেন এরকম অমানবিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ? শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে হচ্ছে এমনটা বলা যাবে না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিগ্রিধারী মানুষেরাই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষার হার বেড়েছে, বেড়েছে ডিগ্রিধারীর সংখ্যা। সরকার প্রায়শই বলছে, শিক্ষায় আমরা বেশ এগিয়ে যাচ্ছি! স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বেড়েছে অনেক। কিন্তু এত শিক্ষিত (!) মানুষেরা সমাজে আলো ছড়াতে পারছে না কেন? কেনইবা আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ক্রমশ গ্রাস করছে? শিক্ষার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণটিকে বোঝা আজ অত্যন্ত জরুরি।

একদিন পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা না চাওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত বিবেকসম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠেছিল সামাজিক আকুতিকে ধারণ করে। নবজাগরণের মনীষীরা সেদিন শিক্ষাকে সবার মধ্যে বিস্তৃত করতে চেয়েছেন, পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠবে– এ আশায়। ইংরেজরা চেয়েছিল শিক্ষা যাতে বেশি বিস্তৃত না হয়, তাদেরই প্রয়োজনে সীমিত সংখ্যক দক্ষ মানুষ তৈরি করতে, যারা দাসত্ব করবে। বিষয়বস্তুও সেভাবে নির্ধারণ করেছিল। বিদ্যাসাগর এর বিরোধিতা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে বার্কলের দর্শন পড়ানোর বদলে ইউরোপীয় যুক্তিবিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের আধুনিক ধারণার সাথে ছাত্রদের পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজদের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানিরাও শিক্ষার অধিকারকে সীমিত করেছিল, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করেছিল। '৬২-তে রক্ত দিয়ে সে শিক্ষানীতিকে প্রতিহত করতে হয়েছিল।

স্বাধীন দেশে পুরোনো সে নীতির বদল ঘটেনি। ৪৪ বছরে বহু শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, কিন্তু সুর একই। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ক্রমাগত অস্বীকৃত হয়েছে। বেসরকারিকরণের ধারাই ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিক থেকেও মানুষ হওয়া, চরিত্র গঠনের বদলে চাকুরি বাগানো, সার্টিফিকেট অর্জনই একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের ফলাফল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা একটা স্তর পেরিয়েই আর এগুতে পারছে না। আর মানের কথা তো বলাই

বাহুল্য। শতভাগ পাশ হচ্ছে। 'এ' প্লাসের ছড়াছড়ি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তাদের সিংহভাগই পাশ করতে পারছে না।

এতোসব অসঙ্গতি দূর করবে যে ছাত্রসমাজ তাদের আত্মকেন্দ্রিকতায় মগ্ন করে তোলা হয়েছে। বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির অপরাজনীতির প্রভাবে চরিত্রহীন করে তোলা হচ্ছে। ফলে আজ জেগে ওঠার প্রয়োজন কেবল শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়, মনুষ্যত্ববিনাশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের জাগরণের জন্যও।

সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায়
শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হয়েছে

সভ্যতার সূচনাকালে মানুষ ও তার সমাজ এতো আধুনিক ও সভ্য ছিল না। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিকূল প্রকৃতি এবং সমাজে টিকে থাকার লড়াই করতে করতেই অফুরান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কোনো এক যুগে এই অভিজ্ঞতার যে ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তা পরবর্তী যুগে নতুনকে জানা-বোঝার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। যুগে যুগে এই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের নামই জ্ঞান। তাই জ্ঞান সমস্ত মানব জাতির সম্পদ। পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া এ সম্পদের উত্তরাধিকার বর্তমানের সকল মানুষ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এ জ্ঞানকে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে রপ্ত করানোর নিয়মকে বলা হয় শিক্ষা। একটা গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শর্তই হলো, ধনী-দরিদ্র,স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা। একটি মানুষকেও অর্থ বা অন্য কোনো বাধার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না করা। কারণ যে জনগণ দেশ পরিচালনা করবে তারা যদি নিরক্ষর হয় ও আধুনিক বিধি-বিধান না জানে তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে কিভাবে? এ জন্য বলা হয় শিক্ষা হলো গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত।

আবার একজন মানুষ শিক্ষিত হবে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নাকি সামাজিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে? শিক্ষিত মানুষ তার দক্ষতা সমাজেই প্রয়োগ করে। তাই সমাজের প্রয়োজনকে ধারণ করা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ হওয়া অসম্ভব। সামাজিক প্রয়োজনকে ধারণ করার অর্থ হলো, মানুষের সংগ্রামের ভিত্তিতে সৃষ্ট যে জ্ঞান অর্জন করলাম, তা মানুষের কল্যাণের জন্যই কাজে লাগাব। আর জ্ঞান কাজে লাগানোর পথে যে বাধা আসবে তার বিরুদ্ধে লড়ব। বহু লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত এ ধারণা আজ প্রতিষ্ঠিত। একদিন রাজারা ছিল সর্বময় ক্ষমতার মালিক। জনগণের কোনো অংশগ্রহণ তাতে ছিল না। সে সময় শাসকরা জনগণকে শোষণের প্রয়োজনে অশিক্ষা, গোঁড়ামি ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেদিন দাবি উঠেছিল, দেশ শাসন করবে জনগণ। সেসময় শিক্ষার ভিত্তি ছিল মনগড়া ধারণা ও অন্ধবিশ্বাস। তাই দাবি উঠলো, বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রমাণিত সত্যের বাইরে কোনো কিছু গ্রহণ করব না। কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সমাজ সম্পর্কে সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত ধারণা দেয়, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। তাই শিক্ষার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নিয়মের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার সমাজকে পরিচালনা করবে। আর উন্নত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র সকল নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এই হলো, শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ।

মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও
৪৪ বছর ধরে শাসকদলগুলো সর্বজনীন শিক্ষার দাবিকে উপেক্ষা করেছে

১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। শিক্ষার অধিকারের দাবিতে এ দেশের ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক সংগ্রামের রক্ত ঝরা দিন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শিক্ষা সচিব এস.এম. শরীফের শিক্ষা কমিশন ঔদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করেছিল, 'সস্তায় শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়'। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা কেমন হবে তা বলতে গিয়ে তারা প্রস্তাব করেছিল, 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত কল্পনা মাত্র'। আর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা বলেছিল, উচ্চশিক্ষা হবে মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য এবং সেখানে 'ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হইবে'। সোজা কথায় এ শিক্ষানীতির মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের ঘোষণা ছিল, 'সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।' এর পাশাপাশি শিক্ষানীতিকে জায়েজ করার জন্য জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়ে তারা শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক, পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। এ দেশের ছাত্র-জনতার মনে এ আন্দোলন নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি করে। মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ আরও অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে শাসকগোষ্ঠী শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার সেদিন এদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়।

শিক্ষা দিবসের ৫৩ বছর পার হতে চলল। কিন্তু সেদিনের ছাত্র আন্দোলনে যে আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়েছিল, তার কতটুকু পূরণ হয়েছে? শাসকদের আজ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। রাশিয়ান সাহিত্যিক টলস্টয় বলেছিলেন : 'জনগণের অজ্ঞতাই শাসকের শক্তির উৎস'। জনগণকে অজ্ঞ রাখা যায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখলে। ইংরেজ-পাকিস্তানিরা শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিল, স্বাধীন দেশেও কেন তা বলবৎ আছে– একথা আমাদের বুঝতে হবে। সেদিন ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবি থাকলেও ২০১৫ সালে এসেও তা অষ্টম শ্রেণীর গণ্ডি পেরুতে পারেনি। অথচ আজ দুনিয়াব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটেছে তাতে অন্তত স্নাতক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার স্তর হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশে এখনও ১০ ভাগ শিশু শিক্ষার আওতায় আসতে পারেনি। শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, 'বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে।' উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত আসতে পারে ৮-৯ শতাংশ। একদিকে মানুষের সীমাহীন অভাব-দারিদ্র্য, অন্যদিকে সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে শিক্ষার প্রতিটি ধাপে ড্রপ আউট হতে থাকে। বাস্তবে কতটুকু দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার? ৮২,২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৩,৬৭২টি সরকারি। প্রায় ১৯ হাজার মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩১৭টি সরকারি। ১২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৩৭টি। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। সে কারণে আমরা দেখি, বিগত মহাজোট সরকারের আমলে প্রণীত 'শিক্ষানীতি ২০১০'-এ শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির ঢালাও সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান সরকারের বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীতিকে উন্মোচিত করেছে

শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এদেশে স্বাধীনতার পূর্বাপর অনেক লড়াই সংগ্রাম হয়েছে। এই সমস্ত শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার যেসব দাবি উচ্চারিত হয়েছে, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা বললেও শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ... কোন ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোন এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান পালন করে করতে হবে।" (অধ্যায়-২ পৃষ্ঠা-৪, ৫) এর ফলে শহর তো বটেই গ্রামেও ব্যক্তি উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেনসহ বিভিন্ন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে।

উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বরাবরই সরকারগুলো অস্বীকার করেছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাতে গোনা। বরং প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যাহত ফি বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে – "সরকারি অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে।" অভিভাবকদের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত না হলেও গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপকহারে নানা ধরনের ফি আরোপ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে নাইটকোর্সসহ নানা ধরনের বাণিজ্যিক কোর্স খোলা হয়েছে।

সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে এই অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করেও বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। বৈষম্যমূলক ইংরেজি মাধ্যম (*English Medium*) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশি ধারায় হয়, সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদনসাপেক্ষে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে।"

মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার তথাকথিত জেহাদ ঘোষণা করলেও মৌলবাদের চাষ হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষায় তা বহাল রেখে বলা হয়েছে, "...ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। (পৃষ্ঠা-৫)

শিক্ষানীতির লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসার মতো সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত করে তা কীভাবে সম্ভব? উপরন্তু মৌলবাদী গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে 'ধর্ম

নিরপেক্ষতা' শব্দটি ও 'ললিত কলা' অধ্যায় বাদ দেয়া হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপূরক আয়োজন নিশ্চিত করা, সেখানে শিক্ষানীতিতে সত্যিকারের মানুষ তৈরির উদ্যোগ নেয়ার বদলে দক্ষ জনশক্তি তৈরির নামে মানুষকে মুনাফা বানানোর যন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, "অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।" এভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদকে রক্ষা করতেই শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছে

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে শোষণমূলক মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট ও কারখানার মালিকানা নিয়ে একটি শ্রেণী বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছে। স্বাধীনতার পর যেখানে কয়েকজন মাত্র কোটিপতি ছিল সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার। এরাই বাংলাদেশের সিংহভাগ সম্পদের মালিক। অন্যদিকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফামের গত ১৯ জানুয়ারি' ১৪ তে প্রকাশিত একটি তথ্যে বলা হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ৮৫ জনের মোট সম্পদের পরিমাণ অর্থমূল্যে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার যা বিশ্বের ৩৫০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, মানুষকে ঠকিয়ে একদিকে পুঁজিপতিরা বিপুল মুনাফা আহরণ করে, সম্পদ সঞ্চয় করে, অন্যদিকে শোষণের কারণে নিদারুণ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয় কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। পুঁজিপতিদের কারখানায় তৈরি পণ্যসামগ্রী অবিক্রীত থেকে যায়। বারবার এই সংকটের কারণে শিল্প পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতিরা আগ্রহ হারাতে থাকে। খুঁজতে থাকে বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র।

এই সংকট থেকে রেহাই পেতে বিভিন্ন সময়ে নানা 'দাওয়াই' -এর ধারাবাহিকতায় আশির দশকের শুরুতে মুক্তবাজার তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। শুরু হয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ। যার মূল কথা হলো অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার সংকোচন এবং বেসরকারিকরণ। ফলে সুযোগ তৈরি হয় সেবাখাতে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো দেশে দেশে এই নীতি কার্যকর করতে ডব্লিউটিও'র নেতৃত্বে গ্যাটস চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশগুলো শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, ব্যাংক, বীমা, জ্বালানি, টেলিকমিউনিকেশনসহ ১৬১টি পরিষেবা খাত বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। এইসব খাত থেকে রাষ্ট্র ক্রমেই দায়িত্ব গুটিয়ে নেবে, ভর্তুকি প্রত্যাহার করবে। বাংলাদেশও এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এর অংশ হিসেবেই জ্বালানি, টেলিকমিউনিকেশন খাত আজ প্রায় বহুজাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। কৃষি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য খাতে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। শিক্ষাখাতেও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন করে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। সেকারণেই আমরা দেখছি, ১৯৯২ সালের আগে যেখানে কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না সেখানে আজ ৮৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আরো ১০৮টি অনুমোদনের অপেক্ষায়।

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিয়েছে

প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় শিক্ষার ভিত্তি। এখানে পাঁচ বছরে একজন যে শিক্ষা অর্জন করে তার উপর নির্ভর করে পরবর্তী ধাপগুলোতে সে কতটা সফলতার সাথে অগ্রসর হবে। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত নানা আয়োজন শিক্ষার্থীদের দেহমনে গড়ে ওঠার জন্য সহায়ক নয়। স্কুলগুলোতে রয়েছে তীব্র শিক্ষক সংকট। ২০১২ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ হাজার। ২০১৩ থেকে এর মধ্যে যোগ হয়েছে আরো ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড স্কুল। পরিসংখ্যান বলছে, পুরোনো সেই ৩৬ হাজার সরকারি স্কুলে ১৫ হাজারেই প্রধান শিক্ষক নেই। বেশিরভাগ স্কুলে গড়ে শিক্ষক আছে মাত্র চারজন। প্রধান শিক্ষক না থাকলে একজনকে ব্যস্ত থাকতে হয় সরকারি ও প্রশাসনিক নানা কাজে। বাকি তিনজনকে প্রাক-প্রাথমিক, ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর সব ক্লাস নিতে হয়। এ কয়জন শিক্ষকের পক্ষে সবার ক্লাস নেয়া, সিলেবাস শেষ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্কুলের পাঠদানের যখন এই হাল তখন এসব স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে শতভাগ ছাত্র কীভাবে পাশ করছে তা আশ্চর্যের বিষয়!

সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে এরকম চরম মানহীনতার কারণে একটু ভালো শিক্ষার প্রত্যাশায় অভিভাবকরা কিন্ডারগার্টেনকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলাদেশের শহর

এলাকায় কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয় ৬৪.৩ শতাংশ এবং সরকারি প্রাথমিকে ভর্তি হয় ১৯.৩ শতাংশ শিশু। বাকিরা অন্যান্য স্কুলে। ঢাকা শহরের বেশিরভাগ সরকারি স্কুলে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই পড়াশুনা করে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের প্রচুর অর্থ খরচ করে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে বাধ্য হয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা এখন ব্যাপক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষারও বেহাল দশা

মাধ্যমিক শিক্ষাও বাণিজ্যিকীকরণের অক্টোপাসে আক্রান্ত। তীব্র শিক্ষক সংকট, বেসরকারি স্কুলগুলোর লাগামহীন ফি বৃদ্ধি, শিক্ষকদের চরম দারিদ্র্য, প্রশিক্ষণহীনতা, নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-অভিভাবকদের অস্পষ্টতা, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিসহ অন্যান্য আয়োজন না থাকায় শত সমস্যায় জর্জরিত। গত পাঁচ বছরে স্কুলগুলোতে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে স্কুল শিক্ষার সাফল্যের সরকারি খতিয়ান আর বাস্তব চিত্র আমরা নিচে কিছুটা পেতে পারি। মুখস্থ বিদ্যাই ছিল একসময় পরীক্ষা পাসের উপায়। বুঝে হোক আর না বুঝে হোক ছাত্রদের গাইড বই কিংবা গৃহ শিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হতে হতো। তাই মুখস্থ বিদ্যা, গাইড বই এবং কোচিং এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নাম পাল্টে ২০১০ সালে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হলো।

প্রবর্তনের ৪ বছর পর সম্প্রতি সরকারের পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সারা দেশে সৃজনশীল পদ্ধতির উপর গবেষণা প্রতিবেদন প্রদান করে। 'একাডেমিক সুপারভিশন' নামের এই অনুসন্ধানে দেখা গেছে ৪৫ ভাগ স্কুলের শিক্ষক এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে পারে না। শুধু তাই নয় তারা সৃজনশীল পদ্ধতি এখনও রপ্ত করতে পারে নি। গত বছর সরকার গণিত বিষয়টিকেও সৃজনশীল পদ্ধতির অধীনে আনে। শুরুতেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এর বিরোধিতা করে। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও কোনো ধারণা দেয়া হয়নি।

স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা অত্যন্ত তীব্র। পত্রিকায় এসেছে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ২১৩টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। আবার ১৫৩২টি সহকারি শিক্ষকের পদ ফাঁকা পড়ে আছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক সংকট আরও ব্যাপক। সরকার শিক্ষানীতিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ এর কথা বলেছে। কিন্তু স্কুলগুলোতে এক সেকশনের জন্য বিষয়ভিত্তিক একজনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার রীতি নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে একজন শিক্ষককেই একাধিক বিষয়ের উপর ছয়টি শ্রেণীতে ক্ষেত্র বিশেষে আট ঘণ্টা করে ক্লাস নিতে হয়। এ অবস্থায় ৪৫ মিনিট সময়ে একজন শিক্ষকের পক্ষে ক্লাস ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা, বুদ্ধি আর কল্পনা শক্তির বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে প্রাইভেট বা কোচিংই হয়ে উঠছে শেষ ভরসা। এছাড়া ৭৮ ভাগ স্কুলে বিজ্ঞানাগার নেই। বেশিরভাগ স্কুলেই লাইব্রেরি অকার্যকর। নেই কোনো সাংস্কৃতিক আয়োজন ও ললিত কলা শিক্ষা। এ অবস্থায় সৃজনশীলতার সফলতা কীভাবে আশা করা যায়? এসব আয়োজন না করে শুধু প্রশ্নপদ্ধতি পাল্টিয়ে আর পাশের হার বাড়িয়ে যারা হাততালি আশা করে, তাদের প্রতারক ছাড়া আর কি বলা যায়?

স্কুল নয়, শিক্ষা এখন কোচিং-টিউটর-গাইডমুখি
খরচ বাড়ছে অভিভাবকের

সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষার্থীরা টেক্সট বইয়ের পরিবর্তে উল্টো গাইড বই নির্ভর হয়ে যায়, ক্লাস শুরুর দুই এক মাস পরেই। গাইড বই কেবল যে শিক্ষার্থীরা কিনছে তা নয় শিক্ষকরা পর্যন্ত তা দেখে ক্লাসে পাঠদান করেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষক শাহবাজ রিয়াজ বলেছেন, 'পাঠ্য পুস্তকে সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা দেয়া থাকে দু একটি করে। অন্যদিকে গাইড বইগুলোতে নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া থাকে অসংখ্য। ভালো ফলাফলের আশায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক এমনকি কাজের চাপে ক্লান্ত শিক্ষক সবাই গাইডমুখী হয়ে পড়েছে। প্রায় সব শিক্ষকই বাজারে প্রচলিত গাইড বইগুলোতে যে নমুনা দেয়া থাকে এবং পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো দেয়া হয় তা অনুসরণ করে শুধু নাম পাল্টিয়ে প্রশ্ন করেন। যার কারণে সৃজনশীল প্রশ্নই এখন গতানুগতিক হয়ে গিয়েছে।' *(সমকাল ৪ ফেব্রুয়ারি '১৪)*

অন্যদিকে স্কুল এবং স্কুলের বাইরে কোচিং ব্যবসা বেশ রমরমা। আবার স্কুলে কোচিং-এর নামে বাধ্যতামূলক ফি আদায় করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোচিং নীতিমালা স্কুলে কোচিং ব্যবসাকে একেবারে বৈধ করে দিয়েছে। এখন শারীরিক শিক্ষার মতো বিষয়গুলোও কোচিং করতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান চট্টগ্রাম শহরের ১৪টি ভালো মানের স্কুল ও শিক্ষার্থীদের উপর গবেষণা করে

দেখিয়েছেন- একজন অভিভাবক তার সন্তানের স্কুল শিক্ষার জন্য গড়ে মাসিক ৬,০৮৪ টাকা খরচ করেন। খরচের বোঝার সবচেয়ে বড় চাপ আসছে কোচিং খরচে যা মোট খরচের ৩৯%। নিম্নবিত্ত পরিবারের ১০ ভাগ শিক্ষার্থী খরচ সাশ্রয় করে এসব স্কুলে টিকে থাকে।

অন্যদিকে প্রতিবছর ভর্তির মৌসুমে ফি নিয়ে চলছে নৈরাজ্য। সরকার ভর্তি ফি সংক্রান্ত নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মফস্বল এলাকায় চার্জসহ ভর্তি ফি সর্ব-সাকুল্যে পাঁচশত টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা) এলাকায় দুই হাজার টাকা, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মহানগরে তিন হাজার টাকা এবং ঢাকা মহানগরে পাঁচ হাজার টাকা। এ পরিমাণ টাকাও সাধারণ মানুষের জন্য বেশি। বাস্তবে ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কেউ মানছে না। সরেজমিনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা যায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি পাঁচ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত। আর বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করার পরও পুনঃভর্তি নামে অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে টাকা নেয়া হচ্ছে। এর বাইরে নামে বেনামে রশিদবিহীন ফি, এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত ফি আদায় তো আছেই। এসব কারণে গরীব নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবন হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। অন্যদিকে সন্তানের পড়ালেখার মান নিশ্চিত করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' : 'ক্লাস ছাড়া পরীক্ষা' শিক্ষার মানকে আরো নামিয়ে দেবে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থীরা যেন নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার 'গিনিপিগ'! আমাদের দেশের গরীব-নিম্নবিত্তের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন এই প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই অযত্ন-অবহেলা আর বৈষম্যের পাহাড় কাঁধে নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলছে এটি। সমস্যার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত না করে বিভিন্ন সময়ে নেয়া হয়েছে খেয়াল খুশিমত সিদ্ধান্ত। এতে সমস্যা আরও বেড়েছে।

সর্বশেষ, বিগত দুই যুগের পুঞ্জিভূত সেশনজট ২০১৮ সাল অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে নিরসনের নামে চলমান পাঁচটি ব্যাচকে (২০০৯-'১০ থেকে ২০১৩-'১৪) টার্গেট করে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণা করেছে। সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে- "ক্রাশ প্রোগ্রামে সকালে ক্লাস ও বিকেলে পরীক্ষা গ্রহণ করে ৯ মাস শিক্ষাবর্ষ ধরে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসের সময়সীমা ৪৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট করা হবে। সকালে পাঠদান ও বিকেলে পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে শুক্রবার পরীক্ষা নেওয়া হবে। স্নাতকে ২১০ দিন ক্লাস, ফরম পূরণে ১৫ দিন, পরীক্ষা ৫৫ দিন, ফল ৯০ দিন এবং প্রতি ক্লাস ৬০ মিনিট নেওয়া হবে। পূর্বে যা ছিল যথাক্রমে ২৪০ দিন, ৩০ দিন, ৭৫ দিন, ১২০ দিন ও প্রতি ক্লাস ৪৫ মিনিট। মাস্টার্সেও এভাবে সময় কমিয়ে আনা হবে। এতে ২০১৭ সালের মধ্যে পুরাতন সকল বর্ষের শিক্ষার্থীরা সেশনজটমুক্ত হতে পারবে। আর এতে ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে সব চেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালের মধ্যে পুরোপুরি সেশনজটমুক্ত হবে।"

সেশনজটের ঘানি যখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তখন এমন ঘোষণায় অনেক শিক্ষার্থীই আশাবাদী হয়ে উঠবেন- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেশনজট 'ক্রাশ' করার নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন 'উচ্চশিক্ষার মানকেই ক্রাশ' করবার বন্দোবস্ত করেছে। শুধু 'পরীক্ষা নিশ্চিত' করেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে চায়। ঘোষণা অনুযায়ী ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত করবার কথা থাকলেও বাস্তবে কলেজগুলোতে চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে পর্যন্ত শিক্ষকরা কয়টি ক্লাস নিয়েছেন? ক্লাস না হলে সিলেবাস শেষ হবে কিভাবে? সিলেবাস শেষ না হলে শিক্ষার্থীরা কিভাবে পরীক্ষা দেবে? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সারাদেশের ভালো কলেজগুলোর ক্লাস পরিস্থিতির চিত্র অত্যন্ত করুণ। ঢাকা, ইডেন, কারমাইকেল কলেজের ২০১১-'১২ এবং ২০১২-'১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী- যারা এখন যথাক্রমে ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ৩য় বর্ষে উঠেছে এবং ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ৩য় বর্ষে উঠবে – তাদের ক্লাস হয়েছে সর্বোচ্চ চার মাস। সরকারি ও পরীক্ষাজনিত নানা ছুটির কারণে বছরে সর্বোচ্চ ক্লাস হয়েছে গড়ে ৮০ দিন। প্রত্যেক বিভাগের সিলেবাসে প্রতি বর্ষেই গড়ে ৭-৮ টি কোর্স থাকে। প্রত্যেকদিন চারটি করে ক্লাস হলেও (প্রতি ক্লাস ৬০ মিনিট করে ৪ ঘণ্টা) একটি কোর্সের ক্লাস গড়ে ১৪-১৫টির বেশি হয়না। অথচ গ্রেডিং পদ্ধতির রুলস-রেগুলেশনে উল্লেখ আছে প্রতি কোর্সের ১৫ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষার আগেই অন্তত ১৫টি ক্লাস হতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতায় বলছেন, নন মেজরসহ অনেক কোর্সের ক্লাস হয়েছে সর্বসাকুল্যে ৩-৪টি! এই যখন ভালো কলেজগুলোর চিত্র তখন জেলা শহরের কলেজগুলোর চিত্র আরো কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তরের মতো উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করতে আসা একজন শিক্ষার্থী তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে সিলেবাসের কতটুকু আয়ত্ব করতে পারছে? উচ্চশিক্ষা তো উচ্চ মানবিক দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করবার কথা, কিন্তু এই যখন হাল তখন যেনতেনভাবে একটা সনদ ধরিয়ে দিয়ে কি মানবসম্পদ তৈরি হবে? পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীও কোনো বর্ষের সব কোর্সে পাশ করে পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারে না। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সাথে পুনরায় অন্তত ৫-৬টি কোর্সের 'মান উন্নয়ন' পরীক্ষা দিতে হয়। ক্লাস ছাড়া পরীক্ষা ছাত্রদের প্রাইভেট টিউটরের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলছে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের অবস্থা এক্ষেত্রে আরো নাজুক। শিক্ষক আর ক্লাসরুম সংখ্যা যা, তা পরীক্ষা নিতেই ব্যস্ত। ইনকোর্সসহ সব ব্যাচের পরীক্ষার সিডিউল ঘোষণা করায় কলেজগুলোতে যেন পরীক্ষার উৎসব চলছে। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু সংকট নিরসনে দরকার ঘোষিত ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত করা। এজন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও ক্লাসরুম নির্মাণ করতে হবে। ক্লাস ও পরীক্ষা যেন একটা আরেকটার প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় সে জন্য অবিলম্বে স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ করা জরুরি। সেই সাথে দরকার লাইব্রেরি-সেমিনারে পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই আর সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি। ন্যূনতম এসব আয়োজন নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র সিডিউল মতো পরীক্ষা নিয়ে সেশনজট হয়তো দূর করা যাবে কিন্তু তাতে উচ্চশিক্ষার মান আরও নীচে নামবে।

এসব যুক্তি করলে শিক্ষকদের অনেকে বলেন, 'ছাত্ররা ক্লাসে আসেনা'। কিন্তু ক্লাসে না আসার দায় কতখানি ছাত্রদের আর কতখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তাও অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। শিক্ষার্থীরা তো বুকভরা স্বপ্ন নিয়েই উচ্চশিক্ষা নিতে আসে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই সে প্রত্যক্ষ করে ক্লাসরুম সংকট, শিক্ষক সংকট, উচ্চমাধ্যমিক-ডিগ্রি-অনার্স-মাস্টার্সের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার কারণে ক্লাস হচ্ছে না, লাইব্রেরি-সেমিনারে রেফারেন্স বই নেই, বিজ্ঞানের বিভাগগুলোতে ল্যাব নেই, পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত বাস নেই, থাকবার জন্য আবাসিক হল নেই ইত্যাদি। গবেষণা, টিএসসি, বিস্তৃত ক্যাম্পাস, ছাত্র সংসদসহ আরও নানা সহায়ক আয়োজন তো চিন্তারও অতীত! ফলে আয়োজনের দরিদ্র দশা নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে ভাবার মনটাকেই মেরে দেয়। তাছাড়া শিক্ষকরাও কি এই আয়োজনের মধ্যে মানসম্মত ক্লাস নিতে পারছেন যা দেখে ছাত্ররা আকৃষ্ট হয়ে ক্লাসমুখী হবে? এতো এতো সংকটের মধ্যে আবার নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের ঢাকাসহ বিভাগীয় বা জেলা শহরগুলোতে মেসে থেকে লেখাপড়ার খরচসহ ন্যূনতম খাওয়া-পড়ার সংগ্রাম করতে ২-৫ টি টিউশন কিংবা পার্ট টাইম চাকুরির পেছনে ছুটতে হয়। আবার শিক্ষার বালাই না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি, ফরম পূরণ, মানোন্নয়ন পরীক্ষার ফি, ইনকোর্স পরীক্ষার ফি, সেমিনার ফি, বিভাগের নামে নানা ফি, ল্যাব ফি, কেন্দ্র ফিসহ নানা খাতে অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত ফি আদায় করছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ সিন্ডিকেট সভায় পরীক্ষা ছাড়াই অনার্স প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর না করে এই সিদ্ধান্ত আরও বৈষম্য তৈরি করবে। এতে গ্রামের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে আরও বেশি বঞ্চিত হবে।

ডিগ্রি (পাস) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ভীষণ সংকটগ্রস্ত

উচ্চশিক্ষার একটা বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী ডিগ্রি কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। সরকারি কলেজগুলোতে এদের জন্য আলাদা কোনো ক্লাসরুম নেই। শিক্ষকও নেই। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডিগ্রি কলেজ আছে যেখানে ইন্টারমিডিয়েটও পড়ানো হয়। জেলা শহরগুলোতে ২/৩টি করে ডিগ্রি কলেজ আছে যেগুলো সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার। আগে দুই বছরের ডিগ্রি কোর্সে ১১০০ নম্বরের সিলেবাস পড়ানো হত। পরবর্তীতে শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছরে উন্নীত করা হয় এবং সিলেবাস করা হয় ১৪০০ নম্বরের। এবার নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে নম্বর আরও বাড়িয়ে ২১০০ নম্বরের সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। সময়কাল ও সিলেবাস বৃদ্ধি ঘটলেও শিক্ষকের সংখ্যা, ক্লাসরুম, লাইব্রেরি-সেমিনারে বই সবই তথৈবচ। কলেজগুলোতে ডিগ্রি এবং ইন্টারমেডিয়েট মিলে বিষয় প্রতি দুই জন শিক্ষক আছে। তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও বেশিরভাগ কলেজে তা দেয়া হয়নি। গত সেশনে গাইবান্ধা সরকারি কলেজে ডিগ্রিতে ১ম বর্ষের ক্লাস হয়েছে মাত্র ছয় দিন। অন্য কলেজগুলোর অবস্থাও তাই। এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ডিগ্রির শিক্ষা কার্যক্রম।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর আরোপের ফলে

শিক্ষার্থীদের ওপর আরও বেশি ব্যয়ের বোঝা চাপবে

১৯৯২ সালে প্রণীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একে 'অলাভজনক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হলেও কার্যত তা হয়নি। বরং সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকার ভ্যাট আরোপ করেছে। ২০১৫-১৬ সালের জাতীয় বাজেটে ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপের সুপারিশ করলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তা ৭.৫ শতাংশ ধার্য হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মালিকেরা বলে দিয়েছে, এই ভ্যাট তারা ছাত্রদের মাধ্যমে আদায় করবে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে – 'অলাভজনক প্রতিষ্ঠান' হলে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভ্যাট আরোপ করা কি নীতি সঙ্গত? এটা কি সরকারের স্ব-বিরোধিতা নয়? ভ্যাট আরোপের যুক্তি হিসেবে সরকার বলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচুর মুনাফা করছে। আসলে সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নতুন নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলে ব্যবসায়ীদের পুঁজি বিনোয়োগের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আজ যে মুনাফা মালিকরা করছে, তার সুযোগ তো সরকারই তাদের করে দিয়েছে। গত ২০১২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুনাফা করেছে ১ হাজার ৮৫০ কোটি ৪২ লাখ ৭০ হাজার টাকা, যার যোগানদাতা দেশের সাধারণ মানুষ।

একটু ভালো ভবিষ্যতের আশায় ভিটে মাটি বন্ধক রেখে, জমি বিক্রি করে, ঋণ করে অনেকেই তাদের সন্তানকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। অনেক শিক্ষার্থী টিউশন, খণ্ডকালীন চাকুরি করে কোনো রকমে শিক্ষাজীবন পরিচালনা করছে। সেই অবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে যখন প্রতিষ্ঠান ভেদে হাজার হাজার টাকা বাড়তি খরচ করতে হবে, তার পরিণতি কী দাঁড়াবে তা কি সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা ভেবে দেখেছেন? যারা এই শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার দায়িত্ব নিতে পারেন না তাদের কি কোনোরকম অধিকার আছে ভ্যাট নামের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার?

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চহারে ফি আদায় করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত আয়োজন খুব সামান্যই থাকে। এর সাথে নামে বেনামে ফি আদায় এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোর্স ফি, রিটেক ফিসহ হাজারো ফি আরোপ করা হয় যখন তখন। সংশোধিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৫ বছরের মধ্যে ন্যূনতম ৫ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোতে ক্যাম্পাস নির্মাণের কথা থাকলেও দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৫টি ব্যতীত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই শর্ত পূরণ করে নি। হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, ব্যাংক, সিএনজি স্টেশন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির উপর ভাড়া করা বাড়িতেই এর ক্যাম্পাস। আবার একেকটি অনুষদ বা বিভাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কমনরুমসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই। প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্সের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের কথা আইনে বলা থাকলেও বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই অস্থায়ী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৫৬ ভাগই প্রভাষক। আর পূর্ণকালীন শিক্ষকদের মধ্যে ৬৭ ভাগই প্রভাষক। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ২০১৩ সাল পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া ৭৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫টিতেই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই। উপ-উপাচার্য ছাড়া ৫০টি আর কোষাধ্যক্ষ ছাড়া ৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। *(জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪)*

গবেষণার অবস্থা আরও নাজুক। ইউজিসি'র প্রতিবেদন বলছে, ২০১৩ সালে ৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২টির কোনো গবেষণা প্রকল্প নেই আর ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এ খাতে এক টাকাও বরাদ্দ করেনি। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন নেই বললেই চলে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ছাত্র রাজনীতির অধিকার তো নেই-ই। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাস, দর্শন, বাংলা সাহিত্যের মতো মৌলিক বিষয়গুলো পড়ানো হয় না। বাজার উপযোগী ব্যবসায়িক কিংবা প্রাযুক্তিক বিষয়গুলোরই পাঠদান চলে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার হাত গুটিয়ে নেয়ায় বেকারত্ব আর মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে এভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সার্টিফিকেট ব্যবসা করে দেদারছে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে নাইটকোর্স চালু, ফি বৃদ্ধিসহ সর্বক্ষেত্রে চলছে ইউজিসি'র কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে স্বীকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজও নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা পড়াশোনা করে। কিন্তু দিনকে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় তাদের প্রবেশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যেভাবে প্রতিবছর ফি বাড়ছে তাতে অনেকে এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে – এই স্বপ্ন দেখার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলছে। অনেকে যুক্তি করেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ফলে শিক্ষার খরচ তো বাড়বেই। শুধু শাসকশ্রেণী নয়, এই যুক্তি এখন অনেক সাধারণ মানুষ, সাধারণ শিক্ষার্থীও করেন। অনেকের ভাবখানা এমন, এই ক'টা টাকাই তো – এ আর এমন কি? খামোখা এর জন্য হাঙ্গামায় জড়িয়ে লাভ কি? তাদের কাছে একটা প্রশ্ন, প্রতি বছর যদি ৫০০/১০০০ টাকা বাড়তে থাকে তাহলে এর শেষ পরিণতি কি হবে, বলতে পারেন? আট-দশ বছর আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩/৪ হাজার টাকায় ভর্তি হওয়া যেতো, এখন সেখানে বিভাগভেদে লাগে ১০/১৫ হাজার টাকা, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি ৩২ হাজার টাকা, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে লাগে ২৫ হাজার টাকা। শিক্ষাকে এভাবে আর্থিক নিক্তিতে পরিমাপ করলে যার টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই সে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তাই বিষয়টাকে শুধু টাকার পরিমাণের দিক থেকে দেখলে চলে না। এর সাথে অনিবার্যভাবে শিক্ষার নীতিগত দিক জড়িত। বর্তমানে শাসকশ্রেণী ক্রমাগত শিক্ষার অধিকার সংকুচিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে বলে শিক্ষার খরচও বাড়ছে – এভাবে যুক্তি করছে। এর পেছনে শাসকশ্রেণীর সূদূর প্রসারী চক্রান্ত আছে।

শিক্ষায় পুঁজি বিনোয়োগের পথ অবারিত করতে ২০০৬ সালে শিক্ষা সংস্কারের নামে ইউজিসি (University Grants Commission-UGC) ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। কৌশলপত্রে, '...আগামী ২০ বছরের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তার বরাদ্দের অংশ ৯০% থেকে কমিয়ে ৭০% এ হ্রাস এবং...বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব অর্থের উৎস তৈরি'র পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ফলে বেতন ফি বাড়ছে কিন্তু কমছে সরকারি বরাদ্দ। মোট বাজেটের আয়তন বাড়লেও শিক্ষা ও ছাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ কমছে। বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র পে-স্কেলের দাবি করা হলেও সরকারের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এভাবে আর্থিক অসচ্ছলতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের বাধ্য করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আয় বাড়াতে। শুধু এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। ফি বৃদ্ধি, বিভিন্ন বাণিজ্যিক কোর্স খুলে, অবকাঠামো ভাড়া দিয়ে এই টাকা আয় করা হবে।

অবকাঠামো ব্যবহার করে আয়ের জন্য বাণিজ্যিক নাইটকোর্স খোলার পথ বাতলে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখেও অর্থনীতি ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে নাইটকোর্স খোলা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধিকাংশ বিভাগে নাইটকোর্স খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে যুক্তি করেন, সান্ধ্যকালীন কোর্স হলে ক্ষতি কী? আমাদের তো আর ফি বাড়ছে না। সামর্থ্যবান চাকুরিজীবীদের টাকায় বিভাগের একটু উন্নতি হলে মন্দ কী? প্রশ্ন থেকে যায়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান না বাড়লে ঝকঝকে টাইলস আর এসি ক্লাসরুম হলেই কি বিভাগের উন্নতি হয়ে যায়? আসলে এই প্রলোভন প্রশাসনের স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র। এখন যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টানা হয় তখন আর বাইরে যেতে হবে না, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাইটকোর্সের দৃষ্টান্ত টানা হবে। এভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশিষ্ট চরিত্রটুকু মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলছে।

শিক্ষাব্যবসা নিশ্চিত করতেই চলছে স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

একসময় প্রশ্ন উঠেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হলে, তার অর্থের যোগান দেবে কে? গণতান্ত্রিক সরকারগুলো একথা মেনে নিয়েছিলো যে অর্থের যোগান সরকার দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার তার থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ও একাডেমিক উভয়ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। কিন্তু আমরা দেখছি সরকার বদলের সাথে সাথে এদেশে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে রদবদল ঘটে। সরকারি আনুগত্যই শীর্ষপদ লাভের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষক থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পর্যন্ত সব-ই দলীয় বিবেচনায় করা হয়। শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, একাডেমিক বিষয়েও যেমন: সিলেবাস, কারিকুলাম প্রণয়নেও সরকার হস্তক্ষেপ করে।

ফলে সরকার যেটুকু বরাদ্দ দেয়, তাকে কেন্দ্র করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করা হচ্ছে। আবার এর বিরুদ্ধে যেন প্রতিরোধ গড়ে ওঠতে না পারে, সেজন্য শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার আয়োজন চলছে। শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংসদকে দীর্ঘদিন ধরে অচল করে রাখা হয়েছে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, যেখানে টিউশন ফি অনেক বেশি, সেখানে প্রকাশ্যে ছাত্র রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। এ বিষয়ে কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, "বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের ছাত্র নেতৃবৃন্দের জোরালো প্রতিবাদের কারণে টিউশন ফি বাড়ানো সম্ভব হয় নি। ... ছাত্রদের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিল নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এবং একাডেমিক সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।"

ফলে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ ও ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচনের পেছনে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যই কাজ করছে।

গবেষণাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন

নদীর প্রাণ হচ্ছে স্রোত আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ গবেষণা। স্রোত না থাকলে যেমন নদী মৃত, গবেষণাহীন বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে গবেষণার সীমিত সুযোগ পেয়েও জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতো পণ্ডিত মানুষের উত্থান ঘটেছে। সীমিত আয়োজন নিয়েও তাঁরা অত বড় হয়েছিলেন। কেননা দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁদের একটা দায়বদ্ধতা ছিল। আজ সেই দায়ও নেই, রাষ্ট্রীয় আয়োজনও শূন্যের কোঠায়। ইউজিসির ৪০তম বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টিতে এক টাকাও গবেষণাখাতে ব্যয় হয়নি। বুয়েট ২০১৩ সালে এই খাতে খরচ করেছে মাত্র ৫৫ লাখ টাকা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় করেছে ১৯ লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর অর্থাৎ ২০১৫-'১৬ অর্থবছরে বাজেটের মাত্র ১.০৫ শতাংশ গবেষণা খাতে বরাদ্দ করেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হার আরও কম। এই সামান্য বরাদ্দ দিয়ে গবেষণা করা যায় না। আবার যতটুকু গবেষণা হয় তাও শিক্ষকদের চাকরির প্রমোশন বা স্থায়ী করার প্রয়োজনে। বেশিরভাগ গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারছে না। সামাজিক স্বার্থে গড়ে ওঠা ও জনগণের করের টাকায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজের কল্যাণে গবেষণা কিংবা মৌলিক বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে না। অথচ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদানে কিছু গবেষণাধর্মী কাজ হচ্ছে; যেখানে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হচ্ছে ওইসব প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মতো। এই প্রসঙ্গে কৌশলপত্রে বলা হয়েছে : "The industries and private sectors should be encouraged to come forward to sponsor/ co-sponsor university research project." অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য শিল্প কারখানা এবং বেসরকারি খাতগুলোকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা উচিত। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বা হেক্যাপের মাধ্যমে গবেষণা খাতে বিশ্বব্যাংকের পুঁজি খাটছে। যেগুলোর ভাগ পাওয়া-না পাওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যেও নানা দ্বন্দ্ব চলছে। এর অর্থ লোপাটেরও নানা খবর পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও পিপিপি-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো বেসরকারিভাবে নির্মিত হচ্ছে।

মৌলিক বিষয়ের চেয়ে বাজারমুখী শিক্ষার প্রাধান্য বাড়ছে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ মানুষ গড়ে উঠছে না

গবেষণা তথা সৃজনধর্মী শিক্ষা না হওয়ায় শিক্ষার্থীরাও পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিনকে দিন হয়ে পড়ছে গতানুগতিক, পরীক্ষা আর সার্টিফিকেট সর্বস্ব। ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট আর ক্লাসটেস্ট-মিডটার্ম-সেমিস্টারসহ হরেক রকমের পরীক্ষার চাপে শিক্ষার্থীরা পিষ্ট। পরীক্ষা নির্ভর হওয়ার কারণে মুখস্থ বিদ্যার প্রতি প্রবণতা বাড়ছে। নতুন সৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে না শিক্ষাঙ্গন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রাণচাঞ্চল্য তৈরিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈচিত্র্যময় আয়োজন নেই। কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, 'চাকুরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্র সংখ্যা, বিষয়বস্তু এবং সিলেবাস নির্ধারিত হবে।' ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন গুরুত্ব হারাচ্ছে আর ব্যবসায়িক শিক্ষা, প্রাযুক্তিক শিক্ষায় জোর দেয়া হচ্ছে বেশি। এই টেকনিক্যাল অ্যাফেসিয়েন্সি একদিকে পুঁজিপতিদের কলকারখানা-ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদ সৃষ্ট বৈষম্য, যাবতীয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটকে আড়াল করার জন্যও সহায়ক। তাই এই ধরনের শিক্ষার প্রসার করছে তারা। সমাজজীবনে এর ফলাফল হচ্ছে ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে এ যুগের মহান

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "একদিকে ধর্মীয়-অধ্যাত্মবাদী কূপমণ্ডূক চিন্তা অন্যদিকে বিজ্ঞানচেতনাহীন কারিগরি শিক্ষা ফ্যাসিবাদী মনন তৈরি করে।" এই ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠলে মানুষ পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সবকিছু গ্রহণ করে। সত্য বিচার, ভালো-মন্দ কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ খোঁজার জন্য যুক্তি বিচারের ধার ধারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমাজে এমন মানুষের সংখ্যাই আজ বাড়ছে। পুঁজিবাদী সমাজকে টিকিয়ে রাখতে শাসকগোষ্ঠীরও প্রয়োজন এমন মানুষ তৈরি করা। সেজন্য তাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য 'বাজারের উপযোগী মানুষ তৈরি করা'। শাসকদের এই বাজার ও মুনাফার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে একদিকে মানবিক বোধহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে ব্যাপক সাধারণ মানুষ হারাচ্ছে উচ্চশিক্ষার অধিকার।

কারিগরি শিক্ষার প্রসারে খণ্ডিত চিন্তার মানুষ তৈরি হচ্ছে পর্যাপ্ত আয়োজনের অভাবে উপযুক্ত দক্ষতাও গড়ে উঠছে না

'কর্মমুখী', 'বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত', 'এই শিক্ষা গ্রহণ করলে কোনো শিক্ষার্থী বেকার থাকবে না', 'নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে' ইত্যাদি কথা বলে সরকার কারিগরি শিক্ষার প্রসার করছে। এর মধ্য দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্য হাসিল হয়। প্রথমত, যে কোনো শিক্ষারই একটি তত্ত্বীয় ও একটি ব্যবহারিক দিক আছে। একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবল ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জানলে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যায় না, খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, "একজন মানুষকে কোনো বিদ্যায় বিশেষত্বের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এর ফলে সে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হতে পারে, কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না। মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা এবং জীবনানুগ উপলব্ধি অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য। যা কিছু সুন্দর এবং নৈতিক দিক থেকে শুভ সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি তাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।" ফলে এরকম টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা সমাজ সম্পর্কেও খণ্ডিত ধারণা, কূপমণ্ডূক মানসিকতা নিয়ে তৈরি হবে। সামগ্রিকতায় কোনো কিছু চিনতে বা বুঝতে শিখবে না।

দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলেও স্ব-কর্মসংস্থানের কথা বলে রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব অস্বীকার করে। আবার কারিগরি শিক্ষা লাভ করেও সবাই যে চাকুরি পাচ্ছে তাও ঠিক নয়। পর্যাপ্ত আয়োজনের অভাবে এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না।

শিক্ষক স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত এবং পুরানো যন্ত্রপাতি, মানহীন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। সম্প্রতি গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কারিগরি শিক্ষার নামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। অনেক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ডাবল শিফটে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার দোকান খোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তো দূরের কথা – শিক্ষকরা ঠিকমতো পাঠদান না করেও রেজিস্টার খাতা-কলমে শিক্ষার্থী দেখিয়ে সরকারি অংশের বেতন-ভাতা থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক ভাতা-খরচাদি ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে লুটে নিচ্ছে। দুর্নীতি এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, এর সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে সরকারের কোনো নজরদারি নেই।

সামাজিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে প্রসার ঘটানো হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার

ব্রিটিশরা প্রথম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা এবং টোলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। নিজেদের শাসনকে স্থায়ী করতে তারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে, কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছিল। একইভাবে সামাজিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে স্বাধীন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। যেহেতু বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা সমাজে তীব্র বৈষম্য তৈরি করে; সেজন্য বৈষম্যের কারণ যে অর্থনৈতিক শোষণ তাকে আড়াল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেকারণেই এমন শিক্ষা দেয়া তাদের প্রয়োজন, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জগৎ-জীবনকে কার্যকারণ সম্পর্কের জ্ঞানে বুঝতে সক্ষম হবে না। সবকিছুকেই কপাল বা সৃষ্টিকর্তার আজ্ঞা হিসেবে বুঝবে।

সাধারণভাবে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশের ছেলে মেয়েরা (কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও) মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতে আসে। এখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা তো দূরের কথা, নিদেনপক্ষে চাকুরি উপযোগী শিক্ষা লাভও সম্ভব হয় না। যে কারণে মন্ত্রী-আমলা, এমনকি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে গরম বক্তৃতা দিলেও

নিজেদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ান না। আবার যারা এখানে পড়ে তাদের অনেকের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারণার সাথে পরিচিতি না থাকায় অন্য অংশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় পিছিয়ে থাকা দশা তৈরি হয়। এ কারণে ব্যক্তিজীবনে প্রবল হীনমন্যতাবোধ, কূপমণ্ডূক ধ্যান-ধারণা, নিজেদের সংকীর্ণ বিশ্বাসে অটল থাকা, পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, আধুনিক সমাজ ও তার জীবনব্যবস্থা, নারী স্বাধীনতা ও সাম্যবোধের চেতনাকে ঘৃণার চোখে দেখবার মনস্তত্ত্ব নিয়ে গড়ে উঠে। আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষাকে 'যুগোপযোগী' করার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সাম্প্রদায়িক যে ছাঁচে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মনন গড়ে ওঠে, তাতে কিছু গণিত-বিজ্ঞান বা যাই পড়ানো হোক না কেন ওই নির্দিষ্ট ছাঁচেই তারা তৈরি হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেখানে স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এই প্রসার সমাজজীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

বাণিজ্যিকীকরণ ছাত্র-শিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ককে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে পরিণত করেছে

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষ তৈরি, চরিত্র নির্মাণ, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মের সাথে পরিচয় ঘটানো। এ কাজটি শিক্ষকের মাধ্যমে হয় বলে তাঁকে মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।" একজন শিক্ষক তাঁর বুদ্ধি-বিবেক-চরিত্র দিয়ে সেই প্রাণসঞ্চারের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক কাল থেকে শিক্ষকেরা তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে আসীন হয়েছেন। যদিও নিজেদের মর্যাদাকর বাঁচার মতো জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা তাঁরা পাননি। ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশের মানুষকে শিক্ষা দিতে চায়নি। তারা মনুষ্যত্ব-মর্যাদাহীন একদল গোলাম বানাতে চেয়েছিল। শত আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেদিন শিক্ষকেরা দেশপ্রেম আর মর্যাদাবোধ জাগিয়ে রাখতেন। বিদ্যাসাগর, রোকেয়া, মাস্টারদা সূর্যসেন, কাজেম আলীদের মতো শিক্ষকেরা ছিলেন তাঁদের ছাত্রদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয় চরিত্র। বীরকন্যা প্রীতিলতা একসময় শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন ছিলেন ছাত্রদের আদর্শ।

ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষকরা এক কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিন আইয়ুব সরকার মুক্তচিন্তা করার অপরাধে অনেক শিক্ষককে চাকুরিচ্যুত করেছিলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহা ছাত্রদের বাঁচানোর জন্য বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। শিক্ষকদের অনেকেই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছিলেন কিন্তু মর্যাদা বিকিয়ে দেননি। কিংবা ছাত্রদের জিম্মি করে অর্থ রোজগারের চিন্তা মাথাতেই আনেননি। ছাত্র-শিক্ষকের এই সামাজিক দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক সেদিন শিক্ষার পরিবেশকে অনেক উঁচু মানে তুলেছিল। দুঃখের বিষয়, আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি অর্থ রোজগারের আশায় ছাত্রদের বেতন-ফি বৃদ্ধির ব্যাপারে শিক্ষকরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন অথবা মৌন সমর্থন দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ফি বিরোধী-নাইটকোর্স বিরোধী আন্দোলন হয়, শিক্ষকরা তখন আন্দোলনের বিরুদ্ধে নামেন। এভাবেই বাণিজ্যিকীকরণ আজ ছাত্র-শিক্ষককে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলে অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেও শিক্ষকরা কি কখনো ভেবেছেন ছাত্রদের বেতন-ফি বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রোজগার বাড়াতে হবে? বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলেছিলেন, "অর্থই পরমার্থ জ্ঞানে যারা বিদ্যা ও বুদ্ধি বিক্রয় করছেন, ন্যায়নীতি বিবর্জিত ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের শিক্ষক বলে গণ্য করা যায় কি? ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক কি ক্রেতা ও বিক্রেতার?"

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়

একথা সত্য যে, শিক্ষকরা এই সমাজেরই মানুষ। তাদেরও পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। মানসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের জন্য যদি একজন শিক্ষককে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়, তাহলে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল পেশা শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করবেন কি করে? শাসকশ্রেণী বরাবরই শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত করেছে। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ লিখেছেন, 'বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম কয়েকটি দেশের সারিতে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষকদের বেতন শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ।' নতুন পে-স্কেলে শিক্ষকদের বেতন বাড়লেও গ্রেড এক ধাপ নীচে নেমে গেছে। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বতন্ত্র পে-স্কেলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। এই প্রেক্ষিতে

কমিশনের চেয়ারম্যান ফরাসউদ্দিন বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটা করা যাবে না।" এ থেকেই বোঝা যায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতার এই দিকটি রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেট এবং শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। একদিকে কম বেতন, অন্যদিকে সামাজিক অনিশ্চয়তা আর সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশা শিক্ষকদের যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জনে মরিয়া করে তুলেছে। ফলে স্কুল পর্যায়ে কোচিং, প্রাইভেটের সাথে শিক্ষকরা যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই শুধু আইন করে কোচিং-প্রাইভেট-টিউশন বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষক সমাজের উপযুক্ত বেতন কাঠামো, সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক সমাজকেও অনুধাবন করতে হবে, যে শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন তাদের উপরই কি আয়ের জন্য নির্ভর করবেন? নাকি যে সরকারি নীতি শিক্ষকদের বঞ্চিত করে, শিক্ষার মর্মচেতনাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে, ছাত্র-শিক্ষককে মুখোমুখি দাঁড় করায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হবেন?

পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিশেষ ভূমিকা থাকা দরকার

দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় তিন পার্বত্য জেলার ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা, দুর্গম ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভাষাগত ভিন্নতার কারণে এই অঞ্চল শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্কুলগুলোতে যাতায়াতের রাস্তা যেমন দুর্গম তেমনি দূরত্বও অনেক। অনেক এলাকায় ১/২ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। শিক্ষকরাও নিয়মিত স্কুলে যান না। ১৪ আগস্ট ২০১৪ প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সাজেক ইউনিয়নে স্কুল গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজার হলেও স্কুলে যায় মাত্র ৩৭১ জন। আর ৫২ হাজার জনবসতি অধ্যুষিত ওই এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র আটটি। এই চিত্র শুধু সাজেক ইউনিয়নের নয় গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের।

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি না হওয়ায় ভিন্ন জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও মননশীলতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ও পাঠ্য বইয়ের সাথে মনোসংযোগ ঘটছে না। ডঃ সৌরভ সিকদার ও মথুরা ত্রিপুরা ২০০৮ সালে এক গবেষণা জরিপে তিন পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়ার প্রধান তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো:- দারিদ্র্য ৪২%, ভাষাগত সমস্যা ২০%, অনুন্নত যোগাযোগ ১২%। একই গবেষণায় ৭০% শিক্ষক মতামত দিয়েছেন পাঠদানে বা পাঠ্য বিষয় বুঝতে তাদের ভাষিক সমস্যা হয়। ইউনিসেফও তাদের এক জরিপে তিন পার্বত্য জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অনগ্রসরতার মূল কারণ হিসেবেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ না থাকাকে চিহ্নিত করেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনতে গেলে এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এলাকায় এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল ও ছাত্রাবাস নির্মাণ, পরিবহন চালু, শিক্ষার্থীদের খাবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রতি বছরই কমছে

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নৈরাজ্যের মূল কারণ কী? শিক্ষাখাতে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের নমুনা দেখলেই এর উত্তর মিলবে। ঐতিহাসিক '৬২-এর ছাত্র আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বহু লড়াই-সংগ্রামে এদেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষাখাতে ২৫ ভাগ বাজেট বরাদ্দের দাবি তুলেছে। কিন্তু রাষ্ট্র উল্টো পথেই হেঁটেছে। সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। ১৯৭২ সালে যেখানে জাতীয় বাজেটের ২১ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল সেখানে ২০১৫-'১৬ অর্থবছরে তা ১০.৭ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই এবার বলেছেন, 'প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে কম বরাদ্দ দেয়া হয় বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে।' শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় জিডিপির মাত্র ২.২৩ শতাংশ, যা নেপালের চাইতেও কম, ভারতে যা চার শতাংশ, শ্রীলংকায় ছয় শতাংশের বেশি। সরকার শুধু মধ্য আয়ের দেশ গড়ার কল্পিত স্বপ্ন দেখাচ্ছে কিন্তু উন্নত ও মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে যে রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছে, তাদের মানব সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে না। এসব দেশ শিক্ষার গুণ ও মান নিশ্চিত করে শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টির শর্ত তৈরি করেছিল।

শিক্ষাখাতে বাজেটের প্রশ্ন আসলেই একই উত্তর শুনতে হয় – 'টাকা নেই'। বর্তমান অর্থবছরে প্রায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষিত হয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ টাকার বড় অংশই আসবে সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকে। তার বিনিময়ে

রাষ্ট্রের কাছ থেকে কি মানুষ শিক্ষায় পর্যাপ্ত বাজেট আশা করতে পারে না? বরাবরের মতোই সামরিক খাতসহ অনুৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের রাখা নগদ অর্থের পরিমাণ এখন প্রায় চার হাজার ৪৫৪ কোটি টাকা। (২০ জুন, যুগান্তর ২০১৫) ২২ লাখ কর দাতার অর্ধেকই কর ফাঁকি দেন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকির নানা প্রয়াসের অন্ত নেই। (১ জুন ২০১৫, ড. মঈনুল ইসলাম) আবার ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সীমাহীন দুর্নীতি, শেয়ারমার্কেট কেলেঙ্কারি, হলমার্ক, ডেসটিনি গ্রুপসহ নানা প্রতিষ্ঠানের নজিরবিহীন আর্থিক জালিয়াতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে। এভাবে একদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি-দুর্নীতি-অপচয় হবে, আর শিক্ষা-চিকিৎসাসহ জনসংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দের কথা এলে 'টাকা নেই'– এমনতর বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত?

পরীক্ষাকেন্দ্রীক লেখাপড়া শিক্ষার্থী মননে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কারণে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, আমরা কী তৈরি করছি– শিক্ষার্থী না পরীক্ষার্থী? পঞ্চম শ্রেণীতে পিইসি, অষ্টম শ্রেণীতে জেএসসি, দশম শ্রেণীতে এসএসসি – স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনটি পরীক্ষা পুরো স্কুল শিক্ষাকে পরীক্ষানির্ভর করে ফেলেছে। শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখলো, তার চেয়ে বড় সূচক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কত শতাংশ পাশ করল কিংবা সর্বোচ্চ গ্রেডের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করবে কে? ভালো গ্রেডের আশায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের একঘেঁয়ে পড়া, হোমওয়ার্ক, কোচিং, স্কুল – এই গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখেন। কারণ ভালো রেজাল্ট চাই। ক্লাসে প্রথম হওয়া বা গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার মানসিক চাপ সব সময় বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ছাত্রদের। অনেক সময় ভালো রেজাল্ট করতে না পেরে বা ভালো কলেজে ভর্তি না হতে পেরে আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে তারা।

কোচিং সেন্টার বা স্কুলগুলো ভালো ফলাফলের আশায় অসাধু শিক্ষা কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হচ্ছে। অনেক অভিভাবক শিশুদের হাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন তুলে দিতেও দ্বিধা করছে না। এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে ধ্বংস হচ্ছে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি। সমাজ জীবনে এর বিরূপ ফল আমরা আঁচ করতে পারছি কি?

খেলাধুলা বা সুস্থ বিনোদনেরও কোনো সুযোগ নেই। অবসর কাটানোর মাধ্যম হলো টিভি দেখা অথবা মোবাইল-কম্পিউটারে গেম্‌স খেলা। খেলাধুলা, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজের মাধ্যমে আগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত, বন্ধুত্ব হত। সে জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে ফেসবুক। ইন্টারনেটে কিশোর যুবকরা নিজেদের বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। কম্পিউটার গেম্‌সে যুদ্ধ অথবা খুনোখুনির খেলা, টিভি-সিনেমায় হিংস্রতা, যৌনতার সুড়সুড়ি ছাত্রদের উগ্র, দায়হীন ও ভোগবাদী মানুষে পরিণত করছে। স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েরা পর্নোগ্রাফিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মার্কেটগুলোতে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি ডাউনলোড করতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ স্কুল ছাত্র। এভাবে রুচি-সংস্কৃতি-সৌন্দর্যবোধের মান ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। এসবের ফলাফলেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে।

প্রতিবাদের মনকে নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবেই ছাত্র-যুব সমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা হচ্ছে

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো শিক্ষার উপর এই যে আক্রমণ, দেশে এত যে অন্যায়, জনজীবনের সমস্যা – এসব নিয়ে আমরা ভাবতে চাইছি না। বাণিজ্যিকীকরণের নীতি ও শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর ভিত নাড়িয়ে দেবার মতো কোনো আন্দোলন গড়ে উঠছে না। অথচ এরকম পরিস্থিতি কি পাকিস্তান আমলে কল্পনা করা যেত? '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা সংকোচনবিরোধী লড়াই, '৬৯-এ স্বৈরশাসক আইয়ুব বিরোধী লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদবিরোধী সংগ্রামে এদেশের ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল লড়াই আজও আমাদের প্রেরণা। সেদিন উত্তাল যৌবন তরঙ্গ শাসকশ্রেণীর সকল জনবিরোধী নীতিকে রুখে দিয়েছিল। ছাত্র-যুবসমাজের সামনে সেদিন একটা আদর্শ ছিল, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজের আদর্শ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে সেই আদর্শের বাস্তবায়ন হলো না, পুঁজিবাদী অর্থনীতিই বহাল থাকল। শাসকশ্রেণী তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্ররাই প্রতিবাদের শক্তি। শুধু বন্দুক-কামান দিয়ে এ শক্তিকে দমানো যায় না। তাই বিবেক-মনুষ্যত্ব ধ্বংস কর, স্বপ্নহীন কর, হতাশায় ডুবিয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দাও। অথবা ভোগবাদে আচ্ছন্ন করে 'খাও দাও স্ফূর্তি কর' এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দাও। তাতে অধিকার-বঞ্চনাতেও ছাত্রসমাজ চোখ বুজে থাকবে। হতাশা ও ভোগবাদ বিস্তার ঘটাচ্ছে মাদকের। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, দেশের প্রায় এক কোটি তরুণ-তরুণী মাদকাসক্ত। পাড়া-মহল্লা তো বটেই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মাদকের অবাধ ও বিপুল বিস্তার ঘটে চলেছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন ইয়াবার কেনাবেচা হয় ৭ কোটি টাকার!

শাসক দলগুলোর সাথে যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলো আজ টেন্ডারবাজি-হলদখল-ভর্তিবাণিজ্য-খুনোখুনির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর এটাকেই রাজনীতির নামে চালানো হচ্ছে। এদের অধঃপতিত কর্মকাণ্ড দেখে ছাত্রসমাজের বড় একটা অংশ রাজনীতিবিমুখ মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে। কিন্তু রাজনীতিবিমুখতা বা ঘৃণা দিয়ে কি অবস্থার বদল ঘটবে? ঘটবে না। গত ৪৪ বছরের ইতিহাস তাই বলে।

চরিত্রের সাধনা ও সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসুন

শেষ করবো একটা চিঠির অংশবিশেষ দিয়ে। চিঠিটি এরকম, "আমি আদৌ জানি না যে আমি কী? এই পরিবারের বা আমার মা বাবার সন্তান, তা না হলে কেন সবসময় এরকম শাসন আর কড়া শাসনের ওপর আমাকে রাখা হয়েছে। কোনো বাবা-মা তাঁর সন্তানকে পড়ালেখার খরচে খোঁটা দেয় না। কিন্তু আমার মা-বাবা সবসময় আমাকে বলে তোর জন্য মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা খরচ করছি। এভাবেই প্রতিনিয়ত বকাঝকা করা হয়। ...যা আমার একটু ভালো লাগত না। কিন্তু আমি এতদিন সহ্য করে ছিলাম। ...এখন আমার আর এসব কিছু সহ্য হচ্ছে না। ...আমাদের ছাত্রদের কী দোষ বলুন, আমরা তো আমাদের মতো চেষ্টা করে যাই।" চিঠিটি লিখেছে আরাফাত শাওন নামের একজন, এসএসসি পরীক্ষায় এ বছর জিপিএ-৫ না পেয়ে যে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আত্মহত্যা কি এটা? অমিত সম্ভাবনাময় যে কিশোরটির চোখ দূরাগত জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকার কথা, জীবনের ঊষালগ্নে জীবন থেকেই কেন সে পালিয়ে গেল? এর উত্তর খোঁজার অবসর আমাদের আছে কি?

সবাই ব্যস্ত তাদের সন্তানদের রেসের ঘোড়া বানিয়ে শিক্ষার রেসকোর্সে চ্যাম্পিয়ান বানাতে। ভালো রেজাল্ট চাই-ই চাই। একের পর এক শিক্ষকের বাড়ি, কোচিং সেন্টারে পড়ার মাধ্যমে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। কোমল, সংবেদনশীল, ভাবুক, সৃষ্টিশীল মনের জন্যে আর কোনো খোরাকের যেন প্রয়োজন নেই। গল্পের বই নেই, খেলাধুলা নেই, দশজনের সাথে মেলামেশা নেই। এভাবে মনটাই তো ছোট হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ বিনোদন, সংস্কৃতির জগৎ অচেনা। চেনা জগতে পঙ্কিলতা আর ভোগের সমারোহ। কী মন নিয়ে কিশোরটি বড় হবে?

চারপাশের জগতে এরকম আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মানুষ অহরহই কি দেখছি না, যারা শিক্ষার সাফল্য নিয়ে, সবচেয়ে ভাল ডিগ্রি নিয়ে চুরি, দুর্নীতি, ক্ষমতার দাপটে অতিষ্ঠ করে তুলছে মানুষের জীবন। ভাবুন তো প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলীর কলমের খোঁচায় অনুমোদন পেয়ে গেছে রানা প্লাজার মতো ভবন, কিংবা জরাজীর্ণ ভুল নক্সার লঞ্চ, যার অনিবার্য ফলাফলে বহু মানুষ জীবন হারিয়েছে। আমরা কি এমন মানুষ চাই?

কেবল ভাল রেজাল্ট হলেই হবে? বড় মানুষ হতে হবে না? দরিদ্র মানুষের বঞ্চনা, হাহাকার, অধিকারহীনতা আমার/আপনার হৃদয়ে যদি বেদনা না জাগায় তাহলে কেমন করে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হব? বড় ডিগ্রীর বড়াই করতে পারব, কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নির্মল অনুভূতিতে হাসতে পারবো তো?

আজ একদিকে বিরাট সংখ্যক মানুষ শিক্ষার বাইরে, অন্যদিকে বাণিজ্যের প্রবল জোয়ারে ভেসে ভেসে মুষ্টিমেয় মানুষের ডিগ্রি অলংকারের চকচকে প্রদর্শনী আমাদের কি এতটুকু লজ্জিত করবে না? সোচ্চার কণ্ঠে আমরা কি বলে উঠবো না, বাণিজ্যে মানুষ মেলে না, চরিত্র মেলে না। আমরা চাই চরিত্রের সাধনা, মনুষ্যোচিত জীবন। সংগ্রামের এ পথে আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই।

আমাদের দাবি

১. স্কুলে কোচিং-ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ কর। শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ করে স্কুলকে শিক্ষার মূল কেন্দ্রে পরিণত কর।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম সমাধান নয়। স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল-ক্লাসরুম নির্মাণ ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত কর। GPA-এর ভিত্তিতে অনার্সে ভর্তি প্রক্রিয়া অবিলম্বে বাতিল কর। সকল ডিগ্রী কলেজে প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করে অনার্স কার্যকর কর।

৩. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইটকোর্স ও ফি বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাতিল করতে হবে।

৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কর আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। সকল

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি ও বেতন সরকারিভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৬. প্রশ্নপত্র ফাঁস করে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংসের চক্রান্ত বন্ধ কর।

৭. শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন-ভাতা, সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত কর।

৮. সর্বস্তরে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ কর। অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি-পর্নোগ্রাফি

৯. নিষিদ্ধ করতে হবে। মাদক-জুয়ার বিস্তার বন্ধ কর।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন নীতির প্রতিবাদে

দেশব্যাপী বিভাগীয় ও আঞ্চলিক

ছাত্র সমাবেশ

রংপুর বিভাগ : ১৭ সেপ্টেম্বর, পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ, রংপুর
রাজশাহী বিভাগ : ১৩ অক্টোবর, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
খুলনা বিভাগ : ১২ সেপ্টেম্বর, শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনা
ময়মনসিংহ : ১৫ সেপ্টেম্বর, রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বর, ময়মনসিংহ
ঢাকা : ১৭ সেপ্টেম্বর, অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট বিভাগ : ১৭ সেপ্টেম্বর, কোর্ট পয়েন্ট, সিলেট
নোয়াখালী : ১৫ সেপ্টেম্বর, মুক্ত ক্ষয়ার, নোয়াখালী
চট্টগ্রাম : ১৬ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর, চট্টগ্রাম

শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৯১২০০২৩১৯, E-mail : studentfront1984@gmail.com প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৫

মূল্য: ৫ টাকা